বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১৭৯-১৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রাজশাহীতে বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

Abstract *This paper examines the problems and prospects of investments in Rajshahi. In the paper, the author has shown that due to the absence of a sound and modern infrastructure, specially rail, river and air transport system, private sector entrepreneurs are not coming here to invest. In these circumstances, the author has opined that the government must come forward to invest here, particularly in the infrastructure sectors and subsectors and also in basic industries like steel and engineering industries. Throughout the paper, the author has tried to point out that there is a huge potential of industrialisation, specially agro-oriented and basic. In the end, he has come to the conclusion that no private sector investments would come here unless and untill infrastructural problems are solved.*

মূল শব্দ *স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধুর সরকার, পুঁজিবাদী বিশ্বের মহাসংকট, লোকসানের ক্ষেত্র, বিনিয়োগ, শিল্পের বিকাশ, পণ্যের ন্যায্যমূল্য, ইপিজেড, পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো, মূলধনের বাজার*

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ৩২ দফার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে যাকে "দিন বদলের সনদ" নামে অভিহিত করা হয়। আর এ সনদ বাস্তবায়নের জন্যে রূপকল্প ২০১০-২০২১ রচনা করা হয় যা দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে (৬ষ্ঠ ও ৭ম) বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়নের কাজ অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে চলছে। ২০০৭

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী; সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি;ফোন: ০১৯১৪২৫৪৫২৪, ই-মেইল: moazzem_hossainkhan@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রুয়েট মানবিক বিভাগ আয়োজিত 'রাজশাহীর উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯।

সালের শেষ দিকে শুরু হওয়া পুঁজিবাদী বিশ্বের মহাসংকট যা অদ্যাবধি চলছে এবং যার পরিণতিতে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল বিশেষ করে আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল ও গ্রিস। এর শুরু হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন শিল্পে। হু হু করে তা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মার্কিন অর্থনীতিতে, পরবর্তী সময়ে উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে। ধাক্কা লেগেছিল জাপানসহ দূরপ্রাচ্যের আরও অনেক দেশের অর্থনীতিতে। এসব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শূন্যের কোঠায় এমনকি ঋণাত্মক হয়ে গিয়েছিল। এখনও এদের মধ্যে অনেক দেশেই প্রবৃদ্ধি সংকট পূর্ববর্তী অবস্থানে যেতে পারেনি। অথচ এ রকম একটা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধি ৬-এর কোটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬.৩% এ পৌঁছেছিল যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য কম (৭.৩%)। আর ৭ম পরিকল্পনায় এ যাবত প্রবৃদ্ধি পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে গেছে এবং

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তা ৮.১৩% এ পৌছে গেছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি (০৮.%)। ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি ১৯৯০-২০১৫) ৭টিই (মোট লক্ষ্য ৮টি) আমরা পুরোপুরি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। আর ৮মটি আংশিক। যাঁর নেতৃত্বে আমাদের দেশের এই অর্জন সেই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর জন্যে একাধিকবার আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, এমডিজি-উত্তর জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যও (এসডিজি ২০১৬-২০৩০) আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব, যদি উন্নত বিশ্বের দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত ধারাগুলো বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কিছুটা উদার হন।

এত ভালো খবরের পাশাপাশি খারাপ খবরও আছে বৈ কি। আসলে পুঁজিবাদী উন্নয়নের নিয়মটাই এই—আলোর পেছনে আঁধার। বলছিলাম অসম ও বৈষম্যপূর্ণ উন্নয়নের কথা। পুঁজিপতি শুধু সেখানেই বিনিয়োগ করবে, যেখানে তার লাভ আছে বা লাভের পরিমাণ বেশি। লোকসানের ক্ষেত্র বা স্থানগুলোতে পুঁজিপতি বিনিয়োগ করবে না। আর সে জন্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে কোনো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগই হয়নি বিগত বছরগুলোতে। বিগত শতাব্দীর সেই নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমল ১৯৯৬-২০০১) মংলা, ঈশ্বরদী ও উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) গড়ে তোলা হলেও এতদিনেও সেখানে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আসেনি। রাজশাহী আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি পশ্চাদ্‌পদ ও অনেকটাই উন্নয়ন-বঞ্চিত এলাকা। বিগত বছরগুলোতে এখানে উল্লেখ করার মতো কোনো বিনিয়োগ বিশেষ করে শিল্পায়নই হয়নি—হোক তা সরকারি বা বেসরকারি। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই আমরা এ অঞ্চলে বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

রাজশাহী অঞ্চলে বিনিয়োগ সম্ভাবনা: বিনিয়োগে সরকারি বনাম বেসরকারি খাত

রাজশাহীতে এযাবৎ কালে বিনিয়োগ যা হয়েছে তা মূলত সরকারি খাতেই হয়েছে বা সরকার করেছে। অবকাঠামো, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, পর্যটনসহ বিভিন্ন খাত, উপখাতের দিকে তাকালে দেখা যাবে—প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ যা হয়েছে সরকারি উদ্যোগেই হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধুর সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, পশ্চাদ্‌পদ এলাকাসমূহের উন্নয়ন সরকারি উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়। আর তাই তো বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শী বাকশাল কর্মসূচির আওতায় দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের

মানেই হচ্ছে অর্থনৈতিক বিপ্লব। প্রথম বিপ্লব ছিল রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন, যা আমরা তাঁর নেতৃত্বে অর্জন করেছিলাম ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে ৯ মাসের এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতি ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানী এবং কোটি কোটি মানুষের অপরিসীম আত্মত্যাগের ফসল ছিল এই স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, অর্থনৈতিক বিপ্লব ছাড়া এ স্বাধীনতা কখনোই টেকসই হতে পারবে না। সে জন্যেই তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, যা দেশি ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা মেনে নিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য (দ্বিতীয় বিপ্লব) থেকে নিবৃত করতে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রকারী স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সংঘটিত হয় মানব ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড—পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনা—যাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়। ব্যতিক্রম ছিলেন তাঁর অতি আদরের দুই কন্যা। তাঁরা ঐ সময়ে জার্মানিতে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। দায়িত্ব পড়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নের।

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জেল-জুলুমের বিনিময়ে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে জাতির পিতার সুযোগ্য সন্তান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের কাজে হাত দেন। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে তিনি প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সুসম্পন্ন করেন। সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করার এক সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কৃষিতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে প্রাণ ফিরিয়ে দেন। কৃষিতে ভর্তুকির ব্যবস্থা পুনরায় চালু করেন। সার-বীজের ন্যায্যমূল্য ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার (দেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা ডুবে গিয়েছিল) পরও ২০০০ সালে বাংলাদেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়, খাদ্য আমদানি বিশেষ করে সরকারি উদ্যোগে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০ লক্ষ টন খাদ্য মুজদ ছিল সে সময়ে। শিল্পে সমস্ত বন্ধ কলকারখানা পুনরায় চালু করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রাজশাহীসহ গোটা দেশের বন্ধকৃত টেক্সটাইল, সিল্ক ও পাটকলসমূহ পুনরায় চালু করা হয়। শেখ হাসিনার সরকার ঐ সময়ে একটি অত্যন্ত দূরদর্শী ও দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর তা হচ্ছে এই যে, তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান জয়দেবপুর মেশিন-টুলস কারখানাকে (খালেদা জিয়ার সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল লোকসানের অজুহাতে) দেশপ্রেমী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয় খুলনা শিপইয়ার্ডকে তিনি দেশপ্রেমী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত লোকসানী ও ঋণগ্রস্ত ছিল এসব প্রতিষ্ঠান। দুটি প্রতিষ্ঠানই দেশের অর্থনীতির জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আমাদের অর্থনীতিতে। একদিকে এরা সামরিক যান ও সরঞ্জাম উৎপাদন করছে; অন্যদিকে বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি এমনকি বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও দেশের জন্যে সরঞ্জাম ও যান উৎপাদন করছে ও সরবরাহ দিচ্ছে। এগুলো ক্রমান্বয়ে আধুনিকায়ন করে বর্তমানে আরও নতুন নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করছে, অনেক লাভ করছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করছে, আমদানি হ্রাসে ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

২০০১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনার আমলের অর্জনসমূহ ভেঙ্গে দেন। মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালে দেশ আবার ১৯৯৬-এর পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। খাদ্যঘাটতিসহ নানা সমস্যায় পড়ে দেশ। প্রায় ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয় বাংলাদেশ। খাদ্য ঘাটতি, বিদ্যুৎ ঘাটতি, শিল্পে উৎপাদন ঘাটতি, পরিবহনে মহানৈরাজ্য, শিক্ষায় লেজেগোবরে অবস্থা, দুর্নীতি প্রভৃতি সব মিলিয়ে দেশে এক মহানৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। সামরিক বাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার (১/১১) এসে নির্বাচনের আয়োজন করে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের সেই নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিপুল

সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসেন। ৩২ দফার নির্বাচনী ইস্তাহারকে "দিন বদলের সনদ" নামে আখ্যায়িত করা হয়। এর অন্যতম একটি ধারা ছিল "ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা"। আসলে " ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানটি আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে যুবসমাজের মস্তিষ্কে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, বিপ্লব ঘটায়। শুধু তা-ই নয়, এ সময়ে (২০০৯-১৩) বাংলাদেশ ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে ফিরে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়, নতুন কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, শিক্ষানীতি, জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমুদ্রসীমা জয়, অসংখ্য মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরুসহ ইত্যাদি অত্যন্ত সফল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালের নির্বাচনেও তারা জয়লাভ করে পুরোদমে পূর্ব মেয়াদে সূচিত মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেয়। অনেকগুলো ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বাকিগুলো শেষ হওয়ার পথে। সবকিছু ছাপিয়ে এ সময়ের সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে 'নিজস্ব টাকায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ'। এর মাধ্যমে আমাদের দেশ বিশ্বের কাছে তার সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সফল নেতৃত্বের প্রমাণ দিতে পেরেছে, মাথা উঁচু করে চলতে শিখেছে। ২০০৯-২০১৮ সময়ের বৃহৎ সাফল্যের মধ্যে আরও যে প্রকল্পগুলোর নাম উল্লেখ না করলেই নয়, সেগুলো হচ্ছে—যথাক্রমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ, পায়রা সমুদ্রবন্দর ও মেট্রোরেল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী নাগাদ (২০২১) এগুলো বাস্তবে রূপলাভ করবে নিঃসন্দেহে। আর তখন আমাদের দেশের চেহারাই পাল্টে যাবে। আর সে জন্যে মহাজোটকে আবার ক্ষমতায় আসতে হবে বৈকি!

যেমনটা বলছিলাম পশ্চাদ্‌পদ এলাকায় বেসরকারি খাত বিনিয়োগে কখনই এগিয়ে আসেনি। একমাত্র সরকারি খাতই এদের ভরসা। অথচ পঁচাত্তরপরবর্তী সরকারগুলো বিশেষ করে সামরিক আমলে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কুপরামর্শে সরকারি খাতকে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি খাতের লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পানির দামে সরকারি ব্যাংকের ঋণে বেসরকারি খাতের তথাকথিত উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কোনো লোকসানী প্রতিষ্ঠান তারা ক্রয় করেনি। আর লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে তারা ঠিকভাবে চালাতে না পেরে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। সরকারি প্রাতিষ্ঠানের জমি, যন্ত্রপাতি বিক্রি করে এবং কম সুদে সরকারি ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দিয়ে তথাকথিত খেলাপিতে পরিণত হয়ে নিজেরাই লাভবান হয়েছে। ভাবা যায় প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ অবলোপন করা হয়েছে! এ টাকাগুলো সত্যি সত্যি অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হলে আমাদের দেশ কত দূর যেতে পারতো! পশ্চাদ্‌পদ এলাকাগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সেই আশির দশক থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে ১০ বছরের কর রেয়াত দেওয়া হচ্ছে। অথচ বেসরকারি খাত তেমন সাড়া দেয়নি, এগিয়ে আসেনি বিনিয়োগ করতে। উত্তরা, ঈশ্বরদী ও মংলা ইপিজেডে এখনো অনেক প্লট খালি পড়ে আছে। ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদে শেখ হাসিনার সরকার এগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আবার সেই সরকারি বিনিয়োগে। কই কোনোও বেসরকারি খাত তো আজ পর্যন্ত একটি ইপিজেড গড়ে তুলল না। তারা যাচ্ছে চট্টগ্রাম ও ঢাকায়, যেখানে লাভ অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের বেসরকারি খাত ঝুঁকিপূর্ণ ও কম লাভজনক স্থান ও ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগে আগ্রহী নয়। রাজশাহীর সপুরায় বিগত শতাব্দীর আশির দশকে কিছু শিল্পকারখানা গড়ে উঠলেও সেগুলো টিকে থাকতে পারেনি। দু-একটা যাও আছে, তা-ও ধুঁকে ধুঁকে চলছে। ঐতিহ্যবাহী সিল্ক কারখানা প্রায় নেই বললেই চলে। যে কয়েকয়টা আছে তা মূলত চীনা ও ভারতীয় কৃত্রিম সিল্ক সুতানির্ভর। অথচ একসময় রাজশাহী সিল্কের সুনাম ও কদর দুটোই ছিল।

পঁচাত্তরপরবর্তী সরকারগুলো সুপরিকল্পিতভাবে বেসরকারি খাতের বিকাশের স্বার্থে সরকারি খাতকে দুর্বল করেছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম শেখ হাসিনার সরকার। তিন মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১,২০০৯-২০১৩ ও ২০১৪-১৮) ব্যক্তিগতভাবে তিনি কিছুটা হলেও সরকারি খাতকে শক্তিশালী করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সরকারি খাতের বন্ধকৃত অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান। একমাত্র তাঁর আমলে রেলওয়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, নতুন নতুন লাইন নির্মিত হচ্ছে এবং সরকারি খাতে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করা হয়েছে। রাজশাহী টেক্সটাইল মিল ও সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল চালুকরণ এ ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

সরকারি খাতের ওপর ভর করে বিকশিত হওয়া আমাদের দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। আর সেটা হচ্ছে এই যে, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা মাঝেমাঝেই সরকার ও জনগণকে জিম্মি করে লাভবান হতে চায়। সাম্প্রতিককালের ফার্মার্স ব্যাংকের দেউলেপনা ও ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে বাধ্যতামূলক ডিপোজিটের হার হ্রাসকরণ এবং সরকারি টাকার ৫০ শতাংশ বেসরকারি ব্যাংকে রাখার বিধান করতে সরকারকে দস্তুরমতো বাধ্য করার ব্যাপারটি গোটা দেশের মানুষকে হতবাক করেছে বটে! এটা বেসরকারি খাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মনে হচ্ছে, তারাই আসলে সরকারি খাত বা এরই অংশ। তারা সুবিধা আদায় করে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের অঙ্গীকার ভুলে গেছে (সুদ হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার বিষয়টি)। বাস কোম্পানির অধিকাংশের মালিক বিএনপিসহ অন্য বিরোধী দলগুলো। নিকট অতীতে ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোটের ডাকা অবরোধের কথা নিশ্চয়ই আমাদের সবার স্মরণ রয়েছে। যদি সরকারি খাতের রেল পরিবহনব্যবস্থা ও স্টিমার সার্ভিস না থাকতো, তাহলে ঢাকাকে তারা সত্যিই সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতো এবং তৎকালীন সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দিতে সক্ষম হতো; হয়তো সরকারের পতনও ত্বরান্বিত হতো। ভাগ্যিস শেখ হাসিনার সরকার রেলওয়ে ও স্টিমার সার্ভিসকে কিছুটা হলেও শক্তিশালী করেছিল। অতএব, সাধু সাবধান—বেসরকারি খাতের আচার-আচারণ বেসরকারি খাতের বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ রাখার স্বার্থে অবশ্যই সরকারি খাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, রাখতে হবে এবং তাকে নিয়ামক ভূমিকা নিতে হবে। বেসরকারি খাতের ঔদ্ধত্যপূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও সামন্তবাদী আচরণ কিছুতেই মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। বেসরকারি খাতের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই এটা জরুরি।

রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা

উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে শিল্প। শিল্পের দ্রুত বিকাশ ছাড়া আজকে উন্নত দেশগুলো তাদের বর্তমানের অবস্থানে আসতে পারতো না। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ অন্য উন্নত দেশসমূহ তাদের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল একমাত্র শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন করার মাধ্যমে। আসলে শিল্পের বিকাশ বিশেষ করে মৌলিক ভারী শিল্পের বিকাশ অর্থনীতির অন্য সকল খাতের বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশ এখনো এক্ষেত্রে দুর্বল বলে আমাদেরকে মৌলিক ভারী শিল্পজাত অধিকাংশ পণ্যই আমদানি করতে হয়। ফলে আমদানি বিল রপ্তানি বিলের চেয়ে সবসময়ই বেশি থাকে। ঘাটতি হয় ব্যালেন্স অব পেমেন্টে। অতএব, শিল্পে বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। প্রশ্ন জাগে রাজশাহী অঞ্চলে তাহলে কোন ধরনের শিল্পায়ন করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি—এখানে সবরনের শিল্পের বিকাশই সম্ভব। তবে সে জন্যে অবশ্যই কিছু প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে। প্রবন্ধের আলোচ্য অংশে আমরা শুধু সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা

করব। হ্যাঁ, ভারী মৌলিক শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা এখানে বিদ্যমান। পদ্মার তীরঘেষে, রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের পাশঘেষে এ ধরনের শিল্প গড়ে ওঠার বা তোলার যথেষ্ট সুযোগ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অন্যান্য খাতের বিকাশ এবং হালকা শিল্পের বিকাশ জরুরি। অথচ এ ধরনের শিল্প এখানে আদৌ গড়ে ওঠেনি। এদিকটায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উদ্যোক্তাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। হালকা শিল্পের বিকাশ বিশেষ করে আইসিটি পণ্য উৎপাদনের শিল্প যেমন মোবাইলফোন, টেলিফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ এখানে রয়েছে। সুযোগ রয়েছে কৃষিপণ্য বিশেষ করে ফলমূল ও সাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্পের বিকাশের। অদ্যাবধি রাজশাহী অঞ্চলে এ জাতীয় কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। আর সে কারণে কৃষিজাত এসব পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না কৃষক, আর আমরা বঞ্চিত হচ্ছি জীবাণুমুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য থেকে। এখানে মাছ, দুগ্ধ ও মাংস, এমনকি পশুর হার প্রক্রিয়াকরণের শিল্প গড়ে তোলার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। রাজশাহী মহানগরের মিলিয়ন জনসংখ্যাকে জীবাণুমুক্ত মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাংস ও মাংসজাত পণ্যের সরবরাহ করতে হলে এর কোনো বিকল্পই নেই। ইদানীং এ অঞ্চলে বেশকিছু ডেইরি ফার্ম, ছাগলের খামার ও হাঁস-মুরগির খামার গড়ে উঠেছে। এসব খামারি ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না তাদের উৎপাদিত পণ্যের এ মর্মে অভিযোগ রয়েছে। কম যান না মৎস্যখামারীরাও; তাদেরও একই অভিযোগ। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বিনিয়োগই হতে পারে এর সমাধান। আর এটা সম্ভব হলে এই অঞ্চল বা এলাকার চাহিদা পূরণ করে বিদেশে কৌটাজাত এসব পণ্য রপ্তানি করা সহজতর হবে। এই অঞ্চলের যত্রতত্র অত্যন্ত মূল্যবান উর্বর জমি ব্যবহার করে গড়ে উঠছে অসংখ্য ইটের ভাটা। সম্ভবত সরকার এটিকে শিল্প ঘোষণা করেছে। ইট উৎপাদন শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এখানে। তবে একে পরিবেশবান্ধব করতে হবে এবং উর্বর জমি নষ্ট না করে পদ্মার পাড়ঘেষে নদীখননের মাধ্যমে প্রাপ্ত মাটি দিয়ে করার কথা এখনই ভাবতে হবে। এতে করে এক ঢিলে তিন পাখি শিকার করা সম্ভব— ১. উর্বর জমি রক্ষা পাবে, ২. পদ্মার খননকাজ অব্যাহত থাকবে, ৩. সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে (পদ্মার নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ বিভিন্ন ভাটার মালিকদের কাছে নিদিষ্ট হারে লিজ দেওয়ার মাধ্যমে)।

পর্যটন ও বিনোদনে বিনিয়োগ সম্ভাবনা

রাজশাহী অঞ্চল অত্যন্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ এলাকা। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, শাহ্ মখদুমের মাজার, পুঠিয়া রাজবাড়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া পদ্মা নদীর পাড়কে কেন্দ্র করে পর্যটন ও বিনোদন শিল্প বিকাশের এক বিশাল সম্ভাবনাও রয়েছে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সুযোগ বিদ্যমান।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও আইটি পার্ক নির্মাণ

বিনিয়োগের আর একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও আইটি পার্ক। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, রাজশাহী এলাকায় বিভাগীয় কেন্দ্র অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সরকারের প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০০) উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) প্রতিষ্ঠা করা হলেও রাজশাহী অঞ্চলে কোনো ইপিজেড হয়নি। এখানে পদ্মার তীর ও রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের পাড়ঘেষে উপযুক্ত স্থানে একাধিক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা অবশ্যই সম্ভব। আর এসব

অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পসহ হালকা ও ভারী শিল্প স্থাপনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু আইটি পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ধারনা করছি, এখানে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, এ অঞ্চলে বিনিয়োগের এক বিশাল সম্বাবনা রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন এ সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়িত হলো না এতদিনেও? এলাকাবাসী ও সরকারের উদাসীনতা একটি কারণ হতে পারে। আর বাকি কারণগুলো মূলত অবকাঠামোগত ও সাংগঠনিক দুর্বলতাসংশ্লিষ্ট। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা এসব দুর্বলতা ও অন্যান্য ঘাটতিসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

অবকাঠামোগত দুর্বলতা

অবকাঠামো হচ্ছে এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি, যার অবর্তমানে হয় উৎপাদন কর্মকাণ্ড একেবারেই সম্ভব নয় অথবা সম্ভব হলেও তা আংশিকভাবে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বড় ধরনের সাফল্য। বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২১ হাজার মেগাওয়াট, আর উৎপাদন হচ্ছে ১১ থেকে ১২ হাজার মেগাওয়াট। এটা নিঃসন্দেহে বিশাল সাফল্য। কারণ, ২০০৯ সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে উৎপাদন ছিল মাত্র ৩ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। জ্বালানি, বিশেষ করে গ্যাসের অভাবে পুরো সক্ষমতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে, গ্যাস আমদানি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিগগিরই সম্পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সঞ্চালন লাইনের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে ইতিমধ্যেই বেশকিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে কারিগরি ত্রুটির সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে। তবে টেকসই সমাধান হচ্ছে মাটির নিচ দিয়ে লাইন টানা। উন্নত দেশগুলোতে তা-ই করা হচ্ছে। এতে খরচ বর্তমানে একটু বেশি হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা অবশ্যই সাশ্রয়ী। কারণ, মাটির নিচের লাইন সাধারণত নষ্ট হয় না, ছিঁড়ে যায় না। অন্য কথায় রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রায় নেই বললেই চলে।

রাজশাহী শিক্ষার নগরী। রাজশাহীতে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। আছে পলিটেকনিক কলেজ। তবে দক্ষ জনবল তৈরিতে আরও পলিটেকনিক ও কারিগরি বিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। কারণ, দ্রুত শিল্পায়ন ও অবকাঠামো গড়ে তুলতে হলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনবল আবশ্যক, যা বর্তমানে স্বল্পসংখ্যক এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তা ছাড়া এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বিশেষ করে আইসিটিবিষয়ক বিভাগ ও বিষয় চালু করা এখন সময়ের দাবি। অন্যথায় এ অঞ্চল তথা দেশ পিছিয়ে পড়বে।

সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের বিষয় হচ্ছে—পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি। কারণ, এটি প্রথমত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; দ্বিতীয়ত, অনেক খরচের ব্যাপার; তৃতীয়ত, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন অত্যন্ত দক্ষ জনবলের দরকার। রাজশাহীতে মূলত অত্যন্ত দুর্বল পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর জন্যে বেসরকারি বিনিয়োগ আসেনি, এখনো আসছে না। ভবিষ্যতেও বিনিয়োগ আসবে না, যদি-না আধুনিক শক্তিশালী পরিবহন অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। পরিবহন অবকাঠামো চার ধরনের : ক) স্থল ; খ) নৌ ; গ) বিমান ও ঘ) পাইপলাইনে পরিবহন। স্থল পরিবহন আবার দুই ধরনের : ১। রেল ও ২। সড়ক পরিবহন। স্থলপরিবহনের মধ্যে রেলপরিবহন হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ,

আরামদায়ক, দ্রুত ও সাশ্রয়ী। আর সে জন্যেই উন্নত দেশগুলোতে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে রেলপরিবহন ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বঙ্গবন্ধুর সরকার রেলপথের বিকাশের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে (১৯৭২-১৯৭৫) রেল মন্ত্রণালয় ছিল, রেলের জন্যে আলাদা বাজেট হতো যেমনটা ভারতে এখনো হচ্ছে। সামরিক শাসক জিয়া এসে রেল মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করে একে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করেন। রেলের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর আমলে রেলে যেখানে স্থলপরিবহনে বরাদ্দের প্রায় ৮০ শতাংশ দেওয়া হতো, সামরিক আমলে এসে তা উল্টে গেল অর্থাৎ সড়কে বরাদ্দ দেওয়া হলো প্রায় ৮০ শতাংশ আর বাকি ২০ শতাংশের মতো রেলে। আশির দশকে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার সড়কপথ নির্মাণ করা হয় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে। রেলকে করা হলো হতশ্রী। অনেক লাইন লোকসানী অজুহাতে বন্ধও করে দেওয়া হলো। ৩ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে ১ হাজার কিলোমিটার রাস্তাও মানসম্পন্ন পাওয়া যাবে না। বেপরোয়া দুর্নীতি হয়েছে সড়ক নির্মাণে। বলা হয়ে থাকে যে, ৮০ শতাংশ টাকাই আত্মসাৎ হয়েছে। সড়কের মান দেখলে এটা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়। যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা। প্রতিদিন ডজন ডজন দুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষের জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। বর্তমানে সড়ক পরিবহনে বিরাজ করছে মহানৈরাজ্যজনক এক অবস্থা, যা কারও কাম্য হতে পারে না। অথচ যদি মাত্র ১০ হাজার কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ করা হতো (বর্তমানে রেলের লাইনের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার কিলোমিটারের মতো), তাহলে আমাদের দেশের অর্থনীতি আরও দক্ষ ও গতিশীল হতো, এত জানমালের ক্ষতি হতো না, এত উর্বর জমি সড়কের তলায় যেতো না, নষ্ট হতো না (আমাদের হিসেবে প্রায় মিলিয়ন হেক্টর জমি সড়ক নির্মাণে চিরতরে হারিয়ে গেছে)। আশার কথা জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা সম্ভবত এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কারণ, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতেই রেল মন্ত্রণালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন, রেলের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। পায়রাবন্দর পর্যন্ত রেল যাবে। শুনতে খুব ভালো লাগছে। প্রশ্ন হলো—কবে হবে, আদৌ হবে তো? রাজশাহীতে বেসরকারি বিনিয়োগ আনতে হলে অবশ্যই এবং অনতিবিলম্বে ঢাকা-রাজশাহী-সোনামসজিদ স্থলবন্দর এবং রাজশাহী-খুলনা রেলপথের আধুনিকায়ন করতে হবে, ডাবল ও ট্রিপল লাইনে উন্নীত করতে হবে, স্টেশনগুলোকে সুপ্রসস্ত করতে হবে, ক্রসিংগুলোতে ওভারপাস নির্মাণ করতে হবে। রেলের সম্পদ রক্ষাসহ যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে লাইনের দুই ধারে ও স্টেশনের দুদিকে উচ্চনিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করতে হবে। সর্বোপরি তেল চুরি বন্ধে রেলকে বিদ্যুতায়িত করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ বিশেষ করে ভারতীয় বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হলে অবশ্যই ভারতের সাথে সরাসরি রেলসংযোগ স্থাপন করতে হবে। প্রথমত, এটা সোনা মসজিদ বন্দর হয়ে করতে হবে। পরে দর্শনাসহ অন্যান্য স্থলবন্দর দিয়েও করা যেতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন পথ হচ্ছে নৌপথ। ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী এলাকায় শক্তিধর পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে নৌবন্দর গড়ে উঠেছিল। কোলকাতা, খুলনা, ঢাকাসহ অন্যান্য নদীবন্দরের সাথে রাজশাহী স্টিমারপথে সংযুক্ত ছিল। নিয়মিত স্টিমার যাতায়াত করত এই পথে। পরিবাহিত হতো যাত্রী ও মালামাল। ব্রিটিশরা কোলকাতা ও মানচেস্টারের পাটকল ও বস্ত্র মিলগুলোর কাঁচামাল বিশেষ করে পাট ও নীল নিয়ে যেতো এখান থেকেই। আর বস্ত্র মিলের উৎপাদিত কাপড় এখানে এনে বাজারজাত করত। সেই রামও নেই, আর অযোধ্যাও নেই। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ হয়ে গেছে। রাজশাহীর গুরুত্বও শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানিরা কিছুই করেনি রাজশাহীকে বাঁচানোর জন্যে। স্বাধীনতার ৪৮ বছরে অবস্থার পরিবর্তন তো হয়-ই নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে বলা যায়। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে এ নৌপথকে পুনরায় চালু করার কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজনে চর কেটে মাটি তুলতে হবে, নদী

খনন করে জাহাজ-লঞ্চ-ট্যাংকার চলাচলের উপযোগী করতে হবে, পন্টুন-জেটি ইত্যাদি নির্মাণসহ একটি আধুনিক নৌবন্দরে রূপান্তরিত করতে হবে রাজশাহীকে। শেখ হাসিনা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন—ছিটমহল বিনিময়, সমুদ্রসীমা জয় ও নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণসহ প্রভৃতি। আমরা আশা করি, তিনি তাঁর চতুর্থ মেয়াদে (২০১৯-২০২৩) আরেকটি অসম্ভবকে সম্ভব করবেন অবশ্যই—রাজশাহীকে পূর্ণাঙ্গ নৌবন্দরে রূপান্তরিত করবেন। পদ্মার তীর রক্ষা, সংরক্ষণ, মাটিকাটা, নদ-নদী খননের মতো কাজগুলো ভারতের ঋণে করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রয়োজন 'পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার' আদলে একটি প্রকল্প ছক প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা। হতে পারে তা ১০ থেকে ২০ বছরমেয়াদি। এ কাজে প্রয়োজনে চীনা সহায়তাও নেওয়া যেতে পারে। পদ্মায় যেহেতু ভারতের অংশীদারত্ব রয়েছে, সেহেতু ভারতের সহযোগিতা অবশ্যই নিতে হবে। পদ্মার তীরে বিশেষ করে রাজশাহী মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসরত মানুষ ও তাদের পরিবারগুলোকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত ফ্ল্যাট-বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে পুনর্বাসিত করতে হবে। অতঃপর পদ্মার তীরকে বিনোদনের উপযোগী সুদৃশ্য অঞ্চলে রূপ দিতে হবে—পার্ক নির্মাণ, পিকনিক স্পট ইত্যাদি করা যেতে পারে। আর একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, পদ্মার সুবিস্তৃত চরে অত্যাধুনিক বিমানবন্দর স্থাপন করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ, বর্তমানে যে বিমানবন্দরটি রয়েছে, তা বেশ ছোট এবং এটাকে বাড়াতে হলে জমি হুকুমদখল করার মতো জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর তার সাথে অনেক উর্বর জমি নষ্ট ও বসতি উচ্ছেদের বিষয়ও জড়িত রয়েছে। কাজেই চরের খাসজমি এই কাজে ব্যবহার করাই সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। জলের দাম দিতে হয় না। আর তাই নৌপথে পরিবহনই পৃথিবীতে সবচেয়ে সস্তা পরিবহন। পরিবহনও করা যায় অনেক অনেক বেশি। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ পণ্য জলপথেই পরিবাহিত হচ্ছে। ৫০ হাজার টনের একটি ট্যাংকার রাজশাহী অঞ্চলের সারা বছরের ডিজেল চাহিদার সমপরিমাণ তেল একবারে নিয়ে আসতে পারে সবচেয়ে কম খরচে। স্বল্প খরচে রাজশাহীর মানুষ তখন ঢাকাসহ অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করতে পারবেন– রেলের অন্তত অর্ধেক এবং বাসের এক-চতুর্থাংশ খরচে। ঢাকাসহ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকার জিনিসপত্রের দামের সাথে এ এলাকার দামেও কোনো পার্থক্য থাকবে না। রাজশাহীর অর্থনীতি হবে অনেক দক্ষ ও উন্নত। আধুনিক পরিবহনব্যবস্থায় বিমানপরিবহন একটি আবশ্যকীয় সংযোজন। কারণ, 'টাইম ইজ মানি'। সময় যত বাঁচানো যায়, ততই লাভ, ততই উৎপাদন। কাজেই রাজশাহীতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে অন্তত একটি সুপরিসর আধুনিক বিমানবন্দর অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে। সর্বশেষ পরিবহন উপায়টি হচ্ছে জলপথে পরিবহন। সাধারণত জল, তেল, গ্যাস ইত্যাদি তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ পরিবহনে এ পথটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাজশাহীতে একমাত্র শেখ হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) প্রথমবারের মতো গ্যাস আসে। তবে গ্যাসের সরবরাহে সার্বিক ঘাটতির কারণে বাণিজ্যিক সংযোগ তো একেবারেই দেওয়া সম্ভব হয়নি, এমনকি সব বাসাবাড়িতেও দেওয়া সম্ভব হয়নি। গ্যাস আমদানি শুরু হয়েছে। ক্রমান্বয়ে আরও আমদানি হবে। দেশীয় উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে অল্প করে হলেও। চাহিদা-সরবরাহের ঘাটতিও হ্রাস পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো গ্যাসের বড় মজুদ আবিষ্কৃত হবে সাগরে। হয়তো তখন রপ্তানির কথাও ভাবতে হবে। তবে আপাতত আমদানি করে হলেও রাজশাহীতে বাণিজ্যিক বিশেষ করে শিল্পে ও বাসা-বাড়িতে গ্যাস দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে, গ্যাসের অভাবে এখানে গ্যাসনির্ভর শিল্পের বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অঞ্চলে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে এদিকে নজর দেওয়া অতি জরুরি বলে আমি মনে করি।

উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

আসলে বিনিয়োগের বাধাসমূহ দূর করতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবেই এবং এর সাথে সাথে অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, হতে বাধ্য। তবে যদি উৎপাদন ও বিপনন সমবায় গড়ে তোলা যায় তবে বিষয়টি আরও স্বচ্ছ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, এতে করে উভয় সমবায়ই আগে থেকে অর্থাৎ বছরের শুরুতেই চুক্তিবদ্ধ থাকবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে। উদাহরণ হচ্ছে মিল্কভিটা ও আড়ং।

বিনিয়োগে অর্থায়ন

যেকোনো বিনিয়োগের জন্যে অর্থায়ন দরকার। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎসহ সবধরনের শিল্পের জন্যেই অর্থের প্রয়োজন। রাজশাহীতে স্বাভাবিক কারণেই মূলধনের বাজার গড়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতে হয়তো বা হবে। বর্তমানে একমাত্র ভরসা ব্যাংকব্যবস্থাই। তবে ব্যাংকব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল—রয়েছে আমলাতান্ত্রিক নানা জটিলতা, সিন্ডিকেট চক্র, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত ও সাধারণ উদ্যোক্তারা ব্যাংকের কাছে অর্থায়নের জন্যে যেতে ভয় পান। তদুপরি রয়েছে তথাকথিত ডাউনপেমেন্ট ও ঘুষের সমস্যা। এগুলো থেকে মুক্ত করতে ব্যাংকিং আইনকানুনেরও আধুনিকায়ন করতে হবে, সংস্কার করতে হবে। সুদের হার শিল্পভেদে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করতে হবে । ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যে সবচেয়ে কম হবে, মাঝাররি জন্যে তার চেয়ে একটু বেশি এবং বৃহৎ শিল্পের জন্যে সবচেয়ে বেশি। আর একটি জিনিস অবশ্যই করতে হবে, আর সেটি হচ্ছে—কৃষিতে উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্যে কৃষিনির্ভর বা কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্যে স্বল্পতম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, পারলে শুধু সার্ভিস চার্জ নিতে হবে। শিল্পায়ন তার প্রাথমিক পর্যায় (রাজশাহী এখন প্রাথমিক পর্যায়েই অবস্থান করছে) অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌছালে, তখন সুদের বিষয়টি ভাবতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজে স্বচ্ছতা খুবই প্রয়োজন—বিভিন্ন ধরনের ঋণ সম্পর্কে শাখাসমূহের সামনে এবং সড়ক ও লোকালয়ের মোড়ে মোড়ে বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। রেডিও, টিভি ও খবরের কাগজে তো থাকবেই। এসব প্রতিষ্ঠানে বিসিকের আদলে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ চালু করার বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে। কারণ, নতুন বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হলে এর কোনো বিকল্পই নেই।

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি

নারী সমাজ আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। নারী আমাদের সরকার প্রধান, বিরোধীদলীয় নেতা, বিরোধী দলের নেতা। তারপরও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ নানা কারণ এর পেছেনে কাজ করছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অন্তত দুটি শাখার এক জরিপে দেখা গেছে, নারী ঋণগ্রহীতা মোট ঋণগ্রহীতার মাত্র ২ শতাংশ। অথচ অসংখ্য শিক্ষিত ছাত্রী এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ছাত্রী বেকার বসে আছেন অথবা শুধু গৃহবধূ হয়েই সংসারের ঘানি টানছেন। ভাবা যায় এই একবিংশ শতাব্দীতে এত বিপুলসংখ্যক ছায়া উদ্যোক্তার কত উদ্ভাবনী শক্তি ও ক্ষমতা তিলে তিলে নীরবে-নিভৃতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে! কত অবদান রাখতে পারতেন তারা তার এলাকার শিল্পায়নে? বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভাবা উচিত আমাদের সবার।

বাংলাদেশ এগোচ্ছে, নারীরাও এগোচ্ছেন। নারী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে। ভবিষ্যতে হয়তো রাজশাহীতেও হবে। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি একত্রিত হলে এবং তাদের যথাযথ সহযোগিতা দিলে রাজশাহীতে বিনিয়োগের আর একটি নতুন দরজা উন্মুক্ত হবে—এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যা

বর্তমানে যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সাংঘাতিকভাবে রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীভূত। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হওয়ায় ঋণ প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময় কয়েক মাস এমনকি বছর লেগে যাচ্ছে। এতে করে ঋণের কার্যকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। আমি মনে করি, এ ধরনের সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করা। একই অফিস থেকে প্লটের বরাদ্দপত্র, বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ, ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, টেলিফোনের সংযোগ, ভিসা ও পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে আমলাতান্ত্রিকতা ও দুর্নীতি হ্রাস পাবে। বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হবেন। অর্থনীতি দক্ষ হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ'—এ রকম একটি কথা অনেক দিন ধরেই চালু আছে উদ্যোক্তা সমাজে। এ উদ্দেশ্যে সরকার এসএমই ফাউন্ডেশন করেছে, যার প্রধান কাজ হচ্ছে উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, সহযোগিতা করা। কিন্তু অদ্যাবধি এটা অনেকটাই ঢাকাকেন্দ্রিক রয়ে আছে। এর কর্মকাণ্ড বিভাগীয় শহরসহ অন্যান্য এলাকায়ও বিস্তৃত করতে হবে। এটা সময়ের দাবি । আমি মনে করি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্যে বিভাগীয় ও জেলাশহরে, এমনকি উপজেলাপর্যায়েও এসএমই ফাউন্ডেশনের অফিস থাকা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার

এখানে আমরা রাজশাহী অঞ্চলে বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বিনিয়োগের যে বিশাল সম্ভাবনা এখানে রয়েছে, তা বাস্তবে রূপ দিতে হলে সমন্বিত উদ্যোগ আবশ্যক। আর অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সরকারকেই করতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতীয় ও চীনা সরকারের ঋণ কাজে লাগাতে হবে। আন্তঃদেশীয় সংযোগ স্থাপনেও তা আবশ্যক। প্রথমদিকে সরকার মৌলিক ভারী শিল্পেও বিনিয়োগ করতে পারে। এমনকি অন্যান্য কিছু শিল্প স্থাপনেও সরকার নেতৃত্ব দিতে পারে। পরবর্তী সময়ে সেগুলো বেসরকারি খাতে বিক্রি করে দেওয়া যাবে। এতে করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হবে। আর একটি কথা— সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বশেষ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সংস্কার বা আধুনিকায়ন করে লাভজনকভাবে চালাতে হবে। প্রয়োজনে আখচাষ বন্ধ করে তরল চিনি আমদানি করে চিনি উৎপাদনে যেতে হবে। ভারত, ব্রাজিল ও কিউবা থেকে তরল চিনি (আধা প্রক্রিয়াকৃত) আমদানি করে আমাদের দেশেরই বেসরকারি চিনিকল মালিকেরা লাভ করতে পারলে সরকারি কারখানাগুলো পারবে না কেন? অবশ্যই পারতে হবে। আর আখের জমি লাভজনক পাটসহ অন্যান্য ফসল আবাদে ব্যবহৃত হবে। বিষয়টি জরুরি। ভেবে দেখতে পারেন সংশ্লিষ্টরা। সবচেয়ে বড় কথা দেশাত্মবোধ। সরকারি বা বেসরকারি যে বা যিনিই হোন না কেন, দেশের প্রতি দরদ, ভালোবাসা থাকলে কর্মে সফলতা আসবেই। আমরা এগিয়ে গেলে বাংলাদেশও এগিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র

১. Bangladesh Planning Commission, Government of the Peoples Republic of Bangladesh (GOPRB) (2018): Bangladesh Delta plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century), Vol. 1 &2, Ministry of Planning, GOPRB, October 2018.

২. GOPRB (2015): Seventh Five Year Plan 2016-2020.

৩. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৫): Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015.

৪. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৩): বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ন।

৫. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৩): Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021. Making Vision 2021 a Reality.

৬. Khan M. M. H. et al (2018): Role of RAKUB for the Empowerment of Women in the North-Western Region of Bangladesh: Some Ethical Issues. Bangladesh Journal of Political Economy (BJPE), Vol. 34, No. 2, December 2018.

৭. Khan M. M. H. (2017): Problems and Prospects of Transport System of Rajshahi City Corporation: A Survey. BJPE, Vol. 3, No. 5, January 2017.

৮. Khan M. M. H. (2012): Roads and Railways Sub-sectors in the Sixth Five Year Plan of Bangladesh: A Comparative Review. BJPE, Vol. 28, Nos. 1 & 2, 2012.

৯. Khan M. M. H. (2011): Transport Sector in the Sixth Five Year Plan of Bangladesh: An overview. BJPE, Vol. 27, Nos. 1 & 2, 2011.

১০. খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন (২০১৭): বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ: কিছু নৈতিক প্রশ্ন। BJPE, Vol. 33, No. 2, December 2017.

১১. খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন (২০১৭): পরিবহন অবকাঠামো পরিকল্পনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। BJPE, Vol. 33, No. 5, January, 2017.

১২. খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন (২০১৭): বাংলাদেশের পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে নৌ পরিবহনের ভূমিকা। BJPE, Vol.24, No.1 & 2, 2008.

১৩. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০১৯): জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯- ২০২০, ২৫ মে, ২০১৯।

১৪. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০১৮): মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৮-২০১৯, ২৬ মে, ২০১৮।

১৫. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০১৬): মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৬-২০১৭, ৩১ মে, ২০১৬।

১৬. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০১২): নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব। জাতীয় সেমিনার, ১৯ জুলাই, ২০১২।